ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1806-1811
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.403

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটোগল্পে প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যবিত্তে উত্তরণ

ড. প্রিয়াঙ্কা প্রধান, *স্বাধীন গবেষক, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Saiyad Mustafa Siraj is an author of fifties of 20th century. He was born and raised in Murshidabad District. His short stories reflect the village life of Murshidabad. His writings describe the lifestyle of lower caste people like 'bagdi', 'bauri', 'bayen', 'hanri' etc living in Murshidabad district. Their society, culture, language, religion, customs can be observed in his writings. He also showed that how their lifestyle becomes changed over the time. They are leaving villages and moving towards the cities. The younger generation is leaving rural professions and looking to work in cities in the hope of earning more. Their mindset is gradually changing. Saiyad Mustafa Siraj has highlited this change in village life over time in his short stories as well as he also depicts the transition of people from the lower classes to the middle class.

Keywords: 'Rarh' area, 'Bagri' area, middle class people, lower caste people, occupation of murshidabad

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্য জগতে আবির্ভাব বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক। বাংলায় তখন নাগরিক সাহিত্যের যুগ। নগর-কেন্দ্রিক সাহিত্যের ভিড়ে সিরাজ চিরাচরিত স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে অভিনবভাবে তুলে ধরলেন গ্রামবাংলাকে। তাঁর কাছে গ্রাম মানে কেবল গাছ-পালা, নদী-পুকুর-মাঠ, চাষের ক্ষেত নয়, তাঁর দৃষ্টিতে গ্রামজীবন ধরা পড়েছে অন্যভাবে। সেখানে প্রকৃতির রূপ যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনই প্রকাশ পেয়েছে মানুষের রূপ। সরলতা, জটিলতা, হিংসা, কাম, ক্রোধ নিয়ে তারা একেবারেই অন্য আধুনিক। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরস্থ রাঢ় অঞ্চলের খোশবাসপুরে গ্রামে। রাঢ়ের রুক্ষ মাটি, পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষ তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে তথা ছোটোগল্পে। রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষ, তাদের জীবন জীবিকা, সুখ-দুঃখ, হতাশা বেদনা, উৎসব বিনোদনের নানান আলেখ্য ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রা, চিন্তা চেতনার যে বিবর্তন ঘটেছে, যা তাদের সামাজিক অবস্থানকেও পরিবর্তনের পথে ঠেলে দিয়েছে— এই বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন তাঁর গল্পমালায়।

মুর্শিদাবাদের প্রায় মাঝ বরাবর প্রবাহিত হয়েছে ভাগীরথী নদী। এই নদীর পশ্চিম দিকের অংশকে বলা হয় রাঢ় অঞ্চল। রাঢ় অঞ্চলের মানুষের কথা বলতে গেলে প্রথমেই রাঢ় অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস জেনে নেওয়া প্রয়োজন। প্রাচীনকাল থেকেই মুর্শিদাবাদের রাজবৃত্তের ইতিহাসে নানা বৈদেশিক

রাজশক্তির আগমন ঘটেছে। কারণ এই অঞ্চল অতীত সময়ে ব্যবসা বানিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাই এখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষের আনাগোনা ছিল। বাণিজ্যের কারণে দীর্ঘদিন এদের একসাথে বসবাস করার ফলে এদের মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতিগত সমন্বয় সাধন হয়েছে। এবং ক্রমশই এরা এই অঞ্চলের বাসিন্দা হয়ে উঠেছে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের আদি বাসিন্দার কথা বললে বলতে হয় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের কথা-

> "বেদাচারহীন অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষেরা ছিল রাঢ়ের আদি বাসিন্দা। সাঁওতালদের একাংশ পরাজিত হয়ে ক্রমশ অরণ্যের অধিবাসী হয়। আর্যীকৃত দ্রাবিড় অস্ট্রিকদের একাংশ সমতলে থাকে এবং হিন্দু সমাজের নিম্নকোটিতে স্থান পায়। রাঢ়ে তপশিলী সম্প্রদায়ের হিন্দুদের প্রাধান্য আছে।"[১]

এখানে অনার্য তপশিলী জাতির মানুষেরই অধিক বসবাস। সাঁওতাল, দ্রাবিড়, মাল পাহাড়ী, ভোটমঙ্গলীয়, রাজবংশী প্রভৃতি নিম্নবর্গের জনজাতিকে এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এরা এবং তপশিলী সম্প্রদায় হিন্দু সমাজ বিশেষভাবে বলতে গেলে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গ গঠন করেছে। বিহার থেকে আগত চাঁই জনগোষ্ঠী এখানকার হিন্দু সমাজে মিশে গেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে আবার হিন্দু জাতির শ্রেণি বিভাজনেও পরিবর্তন এসেছে। অব্রাহ্মণ জনতার একাংশ ব্যবসা বাণিজ্য করে ধনশালী হলেও তারা নিজেদের নীচু জাত থেকে পৃথক করে সমাজে উচ্চস্তরে স্থান পেতে চেয়েছে এবং পেয়েছেও। যেমন তেলি, ধোপা, কৈবর্ত, গোপ থেকে সৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে- তিলি, চাষ, ধোবা, মাহিষ্য ও সদগোপ। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলে এই নিম্নবর্গের হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এখানে মূলত কৈবর্ত্য, চাষা, বায়েন, বাগদি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি তপশিলী গোষ্ঠীর মানুষ অধিক বসবাস করে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখনীতে এই সকল প্রথা সংস্কারে আবদ্ধ অখ্যাত নর নারীর জীবনচর্যা প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের প্রকৃতি-নির্ভর জীবন যাপনের চিত্র ধরা পড়েছে এখানে। যেমন 'পুষ্পবনে হত্যাকাণ্ড', 'কালুডিহির বৃত্তান্ত', 'গাজনতলা', 'জোড়াবট ও বাঁধাঘাটের উপকথা' প্রভৃতি গল্পে মাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রান্তিক মানুষের জীবন যাপনের চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে গ্রাম সমাজেও যে বিবর্তন ঘটেছে তা লেখক এড়িয়ে যান নি। গ্রামজীবনে অর্থাভাব, দারিদ্র্য, জীবিকার সংকট, আর্থিক চাহিদার বৃদ্ধি প্রভৃতি মানুষকে ক্রমশ বিকল্প রোজগারের পথ খুঁজে নিতে বাধ্য করছে। গ্রামের প্রান্তিক মানুষেরা ক্রমশ শহুরে চাকচিক্যতায় মোড়া জীবনের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ছে। এছাড়া গ্রামের নতুন প্রজন্ম আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বুদ্ধি এবং বিত্তকে কাজে লাগিয়ে জীবন নির্বাহ করছে। যার ফল স্বরূপ একদিকে যেমন গ্রামের দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের অর্থাভাব ঘুঁচেছে অন্যদিকে তেমনই তাদের সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থানও পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রমশ দারিদ্র্যের সীমা থেকে বেড়িয়ে এসে তাদের 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটেছে।

'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির আলোচনা প্রসঙ্গে শুরুতেই 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি কাকে বলে- এই সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে বিত্তের অধিকারী হিসাবে যারা খুব উচ্চস্তরে নয় আবার একেবারে নিম্নস্তরেও নয়, মাঝামাঝি স্তরে যাদের অবস্থান তাদের 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে শুধুমাত্র এভাবে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিকে সংজ্ঞায়িত করলে তা যথাযথ হবে না। 'বিত্ত'কে যদি শ্রেণি নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয় তাহলে বিত্তের নিরিখে কেউ হবে উচ্চ মধ্যবিত্ত আবার কেউ হবে নিম্ন মধ্যবিত্ত। কিন্তু এখানে সমস্যা অন্যত্র। আমাদের চারাপাশের সমাজে এরকম দৃষ্টান্তও রয়েছে যেখানে দেখা যায় কারও হয়তো এক কালে অনেক সম্পত্তি অর্থ ছিল, বর্তমানে তার কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব, তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে বলবে সে 'মধ্যবিত্ত'। সুতরাং 'মধ্যবিত্ত' তার কাছে স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিচায়ক। আবার আমাদের সমাজে এমনও নজির রয়েছে যারা 'বিত্ত'এর মাপকাঠিতে নিম্ন কিন্তু জীবনচর্যায় উৎকর্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজে বিশিষ্ট মর্যাদার

অধিকারী হয়েছে। তাদেরকেও 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিতে ফেলা হয়। সুতরাং বিত্তের মাপকাঠিতে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে এটাও ঠিক যে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি 'বিত্ত' এর মাপকাঠিতে নির্ণীত না হলেও 'বিত্ত'ই তার মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাম্প্রতিক কালে অনেকে মনে করেন বিত্ত নয়, বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, 'মধ্যবিত্ত' আসলে একপ্রকার মানসিকতা যারা সব সময় দ্বন্দ্বে ভোগেন। সুতরাং বলা যেতে পারে বিত্তের অধিকারী হিসেবে একেবারে উঁচুতেও নয়, আবার একেবারে নীচেও নয়, মোটামুটিভাবে যারা মধ্যম স্তরে অবস্থান করে, যারা বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে নিযুক্ত থেকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে চায় কিন্তু নিজেদের বৃত্ত ভেঙে বেড়িয়ে আসতে পারে না, আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য করতে গিয়ে নানাবিধ টানাপোড়েনে ভোগেন, যারা একই সঙ্গে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল আবার ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার দ্বন্দ্বে ভোগেন, কখনও সাহায্যকারী, কখনও বা সুযোগ সন্ধানী এই বিপরীত মিশ্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষেরাই সাধারণত 'মধ্যবিত্ত' নামে পরিচিত হওয়ার দাবী রাখে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নানান রকম পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। স্টীম ইঞ্জিন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ লাইন, মুদ্রণ যন্ত্র প্রভৃতির প্রচলন হয়। আইন, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা সবক্ষেত্রেই আসে পরিবর্তন। গড়ে ওঠে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনা বাহিনী, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রশাসনিক অফিস, আদালত প্রভৃতি। এই সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন শিক্ষিত পেশাদারী মানুষের। এবং এখান থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান। শুধুমাত্র শহরে নয় গ্রামে গঞ্জে ভূমিনির্ভর মানুষেরাও লেখা পড়া শিখে চাকরি করতে শহরে ভিড় করে। তার ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদারও উত্তরণ ঘটে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'পুষ্পবনে হত্যাকাণ্ড' গল্পে এর দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। এখানে রয়েছে দুই সময়ের দুই মানুষ, ষষ্ঠীচরণ আর নিমাই। সম্পর্কে তারা পিতা ও পুত্র। ষষ্ঠীচরণ পেশায় মালি, আর পুত্র নিমাই সরকারি চাকুরে। ষষ্ঠীচরণ ছেলেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পিছুপা হয়নি। সে চাইনি তার ছেলে তারই মতো মালি হয়ে বেঁচে থাকুক। তার ছেলে নিমাই বি.এ পাশ, শহরে সরকারি চাকরি করে। ছেলের চাকরি যেমন তার সংসারে আর্থিক অভাব মিটিয়েছে এবং তেমনই গ্রামে তার সম্মান, মর্যাদাও বেড়েছে। ছেলের মধ্য দিয়ে সে পরিচিত হয়েছে শহুরে চাকচিক্য বিলাসিতায় মোড়ানো মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে–

> "নিমাই ঘরে না থাকলে সে তার জিনিসপত্র খুঁটিয়ে পরখ করতে বসে। ক্রিমের কৌটো, পেস্ট কত কী হাতের তালুতে নিয়ে তাকিয়ে থাকে, শোঁকে, ভাবে। অবচেতন আদিম আবেগে ভূতগ্রস্তের মতো মাঝে মাঝে সে যা করে বসে, পরে নিমাই এসে টের পায় এবং ক্ষেপে যায়। একগাদা পেস্ট ওগরানো, মেঝেয় মাখামাখি—নয় তো চুলের ক্রিমের শিশি খতম, এই সব নষ্টামি। আজকাল নিমাই এত ক্ষেপে যায় যে অভব্য কথাও তার মুখে আটকায় না।"[২]

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নিমাই তার বাবার মতো গ্রামের প্রান্তিক জীবনে পড়ে থাকে নি। শহরের মধ্যবিত্ত সমাজের বিলাস ও ভোগবাদী জীবনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে সে। নিমাই সেই 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির প্রতিনিধি যারা প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেও বিদ্যা এবং বুদ্ধিকে অবলম্বন করে বিত্তের অধিকারী হয়ে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রামবাংলায় এভাবেই পেশাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের সামাজিক শ্রেণিগত রূপান্তর ঘটেছে-

> "বিশ শতকের গোড়ার দিকে বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে বা নতুন নতুন বৃত্তি সৃষ্টির ফলে সমাজে আসে গতিশীলতা। বর্ণ ও বৃত্তি ভিত্তিক সমাজে দেখা দেয় আলোড়ন। নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চ বৃত্তি নিয়ে সমাজে উচ্চস্থান পায়, জাতি কাঠামো দুর্বল হতে থাকে।"[৩]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিমাই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিতে উত্তরণের পাশাপাশি রূপান্তরিত মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেও চিত্রিত করেছেন। শহুরে ভোগবাদী জীবনের প্রতি আকর্ষণ, গ্রামীণ ঐতিহ্য, মূল্যবোধে আঘাত হেনেছে। নিমাই গ্রামীণ বৃত্ত থেকে বের হতে চায়। তার চোখে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জ্বলজ্বল করে। বাবার পুষ্পবাগানের রেয়ার ফুল সে দেখতে চায় আভিজাত্য হিসাবে। পুষ্পবাগানের দুর্লভ ফুল আভিজাত্য বহন করলেও পুষ্পবাগানের মালিকে পিতার পরিচয় দেওয়া তার কাছে মর্যাদাহানিকর। তাই বাড়িতে বান্ধবী আসার কথায় সে তার বাবাকে জানায় যে আগামীকাল শহর থেকে তার বান্ধবী আসবে তাই সে সেদিন সে তাকে বাবা বলে ডাকতে পারবে না। কলকাতায় চাকরি করা নিমাই শ্রেণি বদলের স্বপ্ন দেখে, বনেদি পরিবারে নাম লেখাতে চায়। উন্নয়ন চায় সামাজিক অবস্থানের। সময়ের সঙ্গে গ্রামবাংলার এই সামাজিক শ্রেণিগত রূপান্তর ও মানসিকতার পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখনীতে ধরা পড়েছে। তাঁর 'গাজনতলা', 'বাগাল' গল্পেও গ্রামের প্রান্তিক মানুষের মধ্যে 'মধবিত্ত'তে উত্তরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। 'গাজনতলা' গল্পের অন্যতম চরিত্র রামপদ বাগদী চৈত্রের গাজনে যাত্রা করে। যাত্রাদলের বিবেক সে। গমগমে গলায় গান করে। কিন্তু তার মনে সুপ্ত বাসনা রয়েছে যে সে একদিন শহরে রেডিওতে গান করবে। তাই সে বোরজে মশাইয়ের কাছে যায় যদি তিনি তাঁর কলকাতায় বাস করা জামাইকে চিঠি লিখে দেন তাহলে হয়তো সে রেডিওতে চাকরি করার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে 'বাগাল' গল্পে রাঙাদাসীর মধ্যেও ভালোভাবে জীবন নির্বাহের জন্য শহরাভিমুখী হওয়ার মানসিকতা লক্ষ করা যায়। রাঢ় বাংলার মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের একটি রীতি হল বাড়িতে 'বাগাল' রাখা। বাগালের কাজ মূলত গোরু-মোষ চড়ানো, তাদের দেখাশোনা করা, চাষের কাজে সাহায্য করা। এছাড়া মালিক পক্ষের নানান ফরমায়সি কাজও করতে হয় তাদের। বাগালদের চিহ্নিত করা হত কপালে ধারালো শিলা দিয়ে ক্ষত তৈরি করে যাকে 'রাখাল ফোঁটা' বলা হয়। বর্তমানে অবশ্য রাখাল ফোঁটার ধারণাটা প্রায় উঠে গেছে। গল্পের মূল চরিত্র বছর আটেকের হরিবুলা বাগাল। একজন বাগালের সারাদিনের রোজনামচা লেখক হরিবুলার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। হরিবুলা গোরুদের ভালোবাসে। তাদের শরীর খুঁটিয়ে দেখে। ঘা হলে দুর্বো ঘাস মচলে ঘসে দেয়। গোঁদল পোকা ছাড়িয়ে দেয় পেট থেকে। কিন্তু তার মা রাঙাদাসী চায় নি যে সে তার বাবার মতো বাগাল হয়ে জীবন অতিবাহিত করুক। সে চাইতো তার ছেলে স্কুলে লেখাপড়া শিখে চাকুরি করে তাকে খাওয়াবে। কালের পরিহাসে হরিবুলার জীবনের এই উজ্জ্বল সম্ভবনা হয়তো শেষ কিন্তু রাঙাদাসীর আশা ফুরিয়ে যায় নি। সে একজন অতিসাধারণ মণিবের ঘরে গৃহস্থালীর কাজ করা বধূ, তার স্বামী মারা গেছে তারপরেও সে হরিবুলার বাগালী জীবন মেনে নিতে পারে না। তার মনের মধ্যে সুপ্ত বাসনা রয়েছে যে– "ভগবান যদি মুখ তুলে তাকায়, মা বাছা মিলে টাউনে দোকান দুবো।"[৪] গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ যারা আজীবন গ্রামে থেকেছে, প্রকৃতির মাঝে বেড়ে উঠেছে, পিতৃপুরুষের সনাতনী পেশাকে আঁকড়ে ধরে জীবন নির্বাহ করেছে তাদের মধ্যেও যে মানসিকতার বিবর্তন ঘটেছে, নিজেদের দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে রূপান্তকরণের চেষ্টা করেছে— গ্রামের এই সামাজিক শ্রেণিগত বিবর্তন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর রচনায় স্পষ্ট করেছেন।

বিশ শতক থেকেই মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের একটা বড় অংশ দ্রুত গতিতে ছুটছে 'বিত্ত' এবং 'ভোগ'-এর পিছনে। মূল্যবোধ, মানবিক সম্পর্ক, আদর্শবাদের থেকেও তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে বিত্ত ও ভোগবাদী জীবন। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নিত্যনতুন বিলাসপণ্যের তারা উপেক্ষা করতে না পেরে যেন তেন উপায়ে অধিক অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের একটা বৃহৎ অংশ। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এই চালচলন, ভোগবিলাস মানসিকতা শুধু শহর নয়, গ্রামবাংলাতেও সমান্তরালভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'হলুদ পাখির পা' গল্পে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভুবন পাখি ধরা ব্যাধ। যদিও এই পেশায় সে কিছুটা বাধ্য হয়েই এসেছে। তার বাবা ছিল ক্ষেত মজুর। একসময়ে তিনি খুরপী

হাতে শস্যের চারা বুনেছেন, ফসল ফলিয়েছেন। কিন্তু ভুবন বন্যা সংকুল এলাকায় কেবলমাত্র ক্ষেতমজুর হিসাবে নিজেকে আটকে রাখেনি। তার চাহিদা, শৌখিনতা, আধুনিক সংস্কৃতির ছোঁয়া তাকে বাধ্য করেছে যেকোনোভাবে অতিরিক্ত টাকা রোজগারের পথে হাঁটতে। সে শিব পুজোর মেলায় ফাঁক পেলেই জুয়া খেলতে চায়। তার সাধ হয়-

> "আজ পেটপুরে রসগোল্লাই খাবে। পান খাবে এক খিলি। কিনবে একটা সিগ্রেট্র। রাঙা ঠোঁটে সিগ্রেট টানতে টানতে সোজা চলে যাবে রতনের বাড়ি। বলবে – বন্ধু কেমন আছ, দেখতে এলাম হে। তখন, তখন আলোপুরী কি হাসবে আড়চোখে চেয়ে?"[৫]

এখানে সিরাজ দেখিয়েছেন প্রজন্মের হেরফেরে কিভাবে মনোভাব চাহিদা আশা আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন ঘটেছে। ভুবনের বাবা যেভাবে প্রকৃতি নির্ভর দরিদ্র জীবন কাটিয়েছে, ভুবন সেভাবে জীবন কাটায় না। তার কাছে সুখ, বিলাসিতা, অর্থ- এগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি মধ্যবিত্ত জীবনের মানসিক দ্বন্দ্বও তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের একাংশ কেটে যায় শুধুমাত্র সামাজিক সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয় নিয়ে। ভুবনের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কুসুমপুরের ছোটোবাবু সে, গ্রামের শ্রেষ্ঠ 'পাখ্‌মারা' হিসাবে তার একটা সম্মান রয়েছে। তাই সে এমন কোনো কাজ করতে পারে না যাতে তার সম্মান নষ্ট হয়। সে আলোপুরীকে ভালোবাসলেও যেহেতু আলোপুরী পরস্ত্রী, তার বন্ধু রতনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে হয়েছে তাই সে তার ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিতে চেয়েও দিতে পারে না। মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে। গাঁয়ের সম্মান, মূল্যবোধ নাকি অন্তরের কামনা বাসনা— এই দু'ইয়ের দ্বন্দ্ব তার মধ্যে লক্ষ করা আয়। এভাবেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কালের নিয়মে গ্রামের প্রান্তিক মানুষের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার বীজ রোপণ হতে দেখেছেন।

'মধ্যবিত্ত' মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি এবং বিত্তকে অবলম্বন করে জীবন নির্বাহ করা। গ্রামে বুদ্ধি অবলম্বন করে জীবন নির্বাহ করা মধ্যবিত্তের সংখ্যা খুব বেশি নেই বরং বিত্ত-নির্ভর মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক বেশি। এরা গ্রামে সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারকারীর দিক থেকে মধ্যবিত্ত। 'আলেকজান্ডার' গল্পে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ শিবুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলায় এই বিত্ত-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উপস্থাপিত করেছেন। একসময়ে শিবুও ছিল দরিদ্র, প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষ। রেনবো সাহেবের হাতে পড়ে তার দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটেছে—

> "আমেরিকার লোক ছিলেন রেনবো সাহেব। শিবুকে পছন্দ করতেন। সেই সুযোগে শিবু ওই বয়সেই খুব কামিয়ে নিয়েছিল নানা সূত্রে। যাকে বলে টাউটগিরি। শালা ঘেন্না ধরে যায় জীবনটার উপর। দু-চারটে টাকার লোভে কোর্টের ডুমুরতলায় দাঁড়িয়ে বিড়ি টানত। ডুমুরগাছটা মরে গিয়ে এখন শিবুর তেতো স্মৃতিটা ঝাপসা হয়ে গেছে। ওখানে কারও একটা মূর্তি বসালে কেমন হয়? সব খরচ শিবুর।"[৬]

শিবুর অতীত জীবনের স্মৃতি তার মনকে এখনও তাড়িত করে। সে বর্তমানে একজন জোতদার, তার কাছে অনেক ক্ষেত মজুর কাজ করে, সে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিক্ষেত্রে নানান বিবর্তন আনান চেষ্টা করে, দিল্লিতে কৃষি বিষয়ক সেমিনারে যায়, সেরা ফলনের প্রাইজ পায় কিন্তু তার মনের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে অতীত জীবনের একরাশ স্মৃতি। 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার টানাপড়েন, ইতিহাসবোধ, পাশাপাশি ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য— এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায় শিবু চরিত্রের মধ্যে। প্রান্তিক দরিদ্র জীবন থেকে তার যথার্থই উত্তরণ ঘটেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। এভাবেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ গ্রামবাংলায় কখনও জীবন জীবিকার হাত ধরে কখনও বা সময়ের সঙ্গে মানুষের চাহিদা ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা চেতনার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের 'মধ্যবিত্ত'তে উত্তরণের রূপরেখাকে চিহ্নিত করেছেন তাঁর গল্পমালায়।

তথ্যসূত্র:

১) ঝা, শক্তিনাথ। বস্তুবাদী বাউল। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৬।
২) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩২৭।
৩) মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার। বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা,১৯৯৮, পৃ. ৮২।
৪) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৫৮।
৫) তদেব, পৃ. ২১২।
৬) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৫৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
২) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
৩) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) চৌধুরী, কমল। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, প্রথম পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮।
২) কমল চৌধুরী, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, দ্বিতীয় পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১।
৩) হাসান, জাহিরুল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ। পূর্বা, কলকাতা, ২০১৮।
৪) ঝা, শক্তিনাথ। বস্তুবাদী বাউল। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১।
৫) বসু, সজল। ভারতের সমাজভাবনা। প্রাচী পাবলিকেশন্‌স, হাওড়া, ২০০৫।
৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ। গ্রামবাঙলার গড়ন ও ইতিহাস। অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮২।
৭) মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার। বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।